র‍্যাগিং শুধু শিক্ষায়তনেই, নাকি সর্বত্র ?

সুস্মিতা রায়

অয়ন আদককে মনে আছে ? অথবা আমন কাচরু ? এই তালিকায় নাম এল ভুপালের অনিতা শর্মারও। মেধাবী, প্রাণবন্ত, উচ্ছল একেকজন তরুণ। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়তে গেছিলেন। চোখে ছিল একরাশ স্বপ্ন। নতুন কিছু করা। প্রাণোচ্ছল এই তরুণদের জীবনদীপ বেশিদিন জ্বলেনি। আবাসিক শিক্ষায়তনে উচ্চশিক্ষা নিতে গিয়ে 'সিনিয়র' ছাত্রদের অমানুষিক অত্যাচারে প্রাণ হারাল তাঁরা। দেশের দুই প্রান্তের ঘটনা। উপলক্ষ একটি– তা হল নবীনবরণের নামে অত্যাচার, নির্যাতন, নিগ্রহ। চলতি ভাষায় যার নাম র‍্যাগিং। যা শুনলেই ভীতি হয়। সদ্য কৈশোর পেরোনো সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য আবাসিক শিক্ষায়তনে পাঠাতে অভিভাবকদের বুক দুরদুর করে। পশ্চিমবঙ্গের অয়ন আদক বা হিমাচলপ্রদেশের আমন কাচরু শুধু নয়, এই তালিকায় আছে আরও অনেক নাম। উত্তর হোক বা দক্ষিণ, পূর্ব হোক বা পশ্চিম, দেশের সব রাজ্যই কমবেশি এই প্রবণতায় আক্রান্ত। নতুন পড়ুয়ারা শিক্ষায়তনে প্রবেশ করলে তাদের নিয়ে একটু মজা, রসিকতা করার ইচ্ছা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু শুধু নির্মল আনন্দে সীমাবদ্ধ না থেকে তা যখন হিংস্র হয়ে ওঠে, রক্তাক্ত হয় নির্যাতিতের দেহমন, তখন তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হয়ে ওঠে। শুধু ছাত্র নয়, ছাত্রীদের ওপরেও চলে একই রকম অত্যাচার। শুধু তো প্রাণঘাতী নয়, বিকৃত র‍্যাগিং-এর প্রভাবে কত তরুণ-তরুণী মানসিক ভারসাম্য হারায়, তার খবর অনেকেই রাখে না। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিই তা চিরদিন মনে রাখে। তাদের মনে যে চিরস্থায়ী ক্ষত হয়ে যায়, তা কোনোদিন মোছে না।

উনিশশো সাতানব্বই সালে তামিলনাড়ু সরকার প্রথম র‍্যাগিং বিরোধী আইন প্রণয়ন করে। তখনও দেশের অন্যত্র এসব নিয়ে সচেতনতা অত ছিল না। নবীনদের নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে সিনিয়রদের আনন্দ পাওয়াকে অনেকেই নিছক মজা বলে ভাবতেন। আসলে এ-ও তো এক রকমের খেলাই। নানা ধরনের ধাঁধা, বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়া হয় নবাগত পড়ুয়াদের। কাউকে হয়তো বলা হয় হাওয়ায় উড়তে, কাউকে গান গাইতে, নাচতে, অঙ্গভঙ্গি সহকারে অভিনয় করতে। এতে সত্যিই দোষের কিছু নেই। বরং পারস্পরিক অপরিচয়ের গন্ডি কাটিয়ে এইসবের মাধ্যমে সহজ হওয়া যায়। কিন্তু যখন কোনও নবাগতদের ওপর শারীরিক-মানসিক পীড়ন চালায় ছাত্র নামধারী দুষ্কৃতীরা,তখনই তা হয়ে ওঠে র‍্যাগিং। তরুণ মনের আড়ালে কেন যে এইসব নৃশংসতার বীজবপন হয়, তার হদিস কেউ জানে না। এদের হিংস্রতার শিকার হয় অয়ন, আমনের মতো কত শত নিরীহ পড়ুয়া। শরীর-মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে তাদের কেউ কেউ পাড়ি দায় মৃত্যুলোকে। সারা দেশে এই তালিকাটি গত কয়েক বছরে বেশ লম্বা-ই ছিল। সম্প্রতি শিক্ষায়তনগুলি কঠোর হওয়ায়, পড়ুয়া, সাধারণ মানুষ সচেতন হওয়ায় এই প্রবণতা কিছুটা হলেও কমেছে। অবশ্যই এর নেপথ্যে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের অবদান কম নয়।

একের পর এক শিক্ষায়তনে বীভৎস র‍্যাগিং-এর ঘটনা গোচরে আসার পর নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে প্রাক্তন সিবিআই অধিকর্তা আর কে রাঘবনের নেতৃত্বে গঠিত হয় কমিটি। তার সুপারিশ কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হয়। সবই হয় অনেক দেরিতে। মূলত ২০০৯ সালে আমন কাচরুর মর্মান্তিক ও নৃশংস মৃত্যুর পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। তড়িঘড়ি একের পর এক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। চলে নজরদারি, ধরপাকড়। কিন্তু র‍্যাগিং বিরোধী আইন করলেই তো হয় না, তা রূপায়িত করার জন্য নজরদারি প্রয়োজন। সর্বোপরি চাই সচেতনতা। সম্প্রতি কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং বিরোধী প্রচার অভিযান চলেছে। পরাগ সরকারের তোলা বিভিন্ন ছবির হোর্ডিং ছড়িয়ে আছে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। গত ৩ আগস্ট থেকে এই প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। চলবে ১৪ আগস্ট অবধি। পরাগের কথায়, কেন্দ্রীয় সরকার নড়েচড়ে বসার আগে থেকেই তিনি এই অ্যান্টি র‍্যাগিং আন্দোলনে যুক্ত। ২০০৬ সালে প্রথম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর তোলা ছবির মাধ্যমে সচেতনতা প্রচার শুরু হয়। সারা দেশে যা প্রথম বলে দাবি তাঁর। ছবি তোলার মাধ্যমে জীবনের নানা খুঁটিনাটি ক্যামেরাবন্দি করেন পরাগ। পরিবেশ নিয়ে ভাবেন। হোলির আনন্দ অনেকের কাছে ম্লান হয়ে যায় বিষাক্ত রংয়ের দৌরাত্ম্যে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে আবির তৈরি করে। এই গবেষণালব্ধ বিষয়ের ওপরেও তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন পরাগ। যা তিনি ছড়িয়ে দিতে চান উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের সর্বত্র। উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কত কিছু যে করা যায় তা ভাবেন। র‍্যাগিং নিয়ে তাঁর ভাবনা, হোর্ডিং-এর মাধ্যমে তা দৃশ্যায়িত করাকে ছড়িয়ে দিতে চান অন্য শিক্ষায়তনেও। উদ্দেশ্য একটাই, র‍্যাগিং বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সম্প্রতি কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং বিরোধী প্রচার অভিযান চলেছে। পরাগ সরকারের তোলা বিভিন্ন ছবির হোর্ডিং ছড়িয়ে আছে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। গত ৩ আগস্ট থেকে এই প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। চলবে ১৪ আগস্ট অবধি। পরাগের কথায়, কেন্দ্রীয় সরকার নড়েচড়ে বসার আগে থেকেই তিনি এই অ্যান্টি র‍্যাগিং আন্দোলনে যুক্ত।

কিন্তু সর্বোচ্চ আদালতের কঠোর নির্দেশ, অথবা সরকারের বিধি কি সত্যিই র‍্যাগিং নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে ? ২০০৯ সালে র‍্যাগিং-এর ফলে গুরুতর আহত আমন কাচরু মস্তিষ্কের রক্তক্ষণে শেষ নিশ্বাস ফেলে। এরপর নড়েচড়ে বসে ইউজিসি সহ অন্যান্য সরকারি সংস্থা। সচেতন হয় পড়ুয়ারাও। তবু গতবছর কোলাঘাট ও বেঙ্গালুরুতেও র‍্যাগিং-এর দাপটে প্রাণ হারায় দুই ছাত্র। হিমাচলপ্রদেশের আমন মেডিকেল কলেজে পড়তে গেছিল। স্বপ্ন ছিল চিকিৎসক হওয়ার। সেই স্বপ্ন তার অকালে চিরতরে শেষ হয়ে যায়।

তবে, র‍্যাগিং কি শুধু শিক্ষায়তনের পড়ুয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ? শিক্ষকরা এক একেকজন পড়ুয়ার ওপর যে নিগ্রহ করেন, তা-ও কি 'র‍্যাগিং' নয় ? অতি সম্প্রতি জলপাইগুড়ির যে কিশোর শিক্ষকদের কড়া ভূমিকায় বাড়ি এসে আত্মহত্যা করল, সে-ও তো র‍্যাগিংয়েরই শিকার। সিনিয়র ছাত্রের পরিবর্তে খলনায়ক তো ওখানে ছিলেন শিক্ষকরাই। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প হইচই করতে গিয়ে নাকি বেঞ্চি ভেঙেছে সে। তার দাম তাকেই দিতে হবে, এই ফতোয়া জারির আগে শিক্ষকরা একবারও ভেবে দেখলেন না তার মানসিক অবস্থার কথা। একমাত্র সন্তানহারা পিতামাতার অন্তরের শূন্যতা কি তাঁরা কোনোভাবে পূরণ করতে পেরেছেন ? পণের জন্যে বধূ নিগ্রহ, সে-ও তো একরকম র‍্যাগিং। জীবনের নতুন পথে সদ্য পা দেওয়া এক তরুণী, যে ছেড়ে এসেছে তার পিতৃগৃহ, তাকে আপন করে নেওয়ার জন্য আগ্রহ কোথায় চোখে পড়ে! বরং নিত্য গঞ্জনা, কথার হুল ফুটিয়ে একটি তরুণ মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়ার যে বীভৎস আনন্দ, তা-ও একধরনের র‍্যাগিং-ই। যতক্ষণ না বধূটি সব নিগ্রহ সহ্য করে শেষ নিশ্বাস ফেলবে, ততক্ষণ কেউ জানতেও পারবে না কী অসহ্য ব্যথা সহ্য করে সে থেকেছে। আঘাত তো শুধু শারীরিক নয়, মানসিকভাবে আঘাতও যে কত ক্ষতিকর তা ক-জন উপলব্ধি করেন ? মানসিক রোগী ও ভারসাম্যহীনদের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি। একবার কেউ টের পেলেই হল, শুরু হয় তাকে আরও মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করার প্রয়াস। অনেক সময় তা হয় নিছক 'মজা' বা 'হাস্য পরিহাস'-এর মোড়কে।

এই সমাজে মৃত্যু বা হত্যার মতো চরম পরিণতি না হলে কোনও কিছুই নড়েচড়ে বসে না। না প্রশাসন, না সরকার। এমনকি পরিজনরাও কত সময় ভুল বোঝেন। আমল দিতে চান না আপনজনের অভিযোগ, ক্ষোভ, দুঃখকে। বলেন, সমঝোতা করতে, মেনে নিতে। বেশিরভাগ মানুষ তাই করেন। মেনে নেন, সমঝোতা করেন প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে। এতে কখনও ফল দেয়, কখনও দেয় না। সংঘাত, প্রত্যাঘাত তো সত্যিই কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

ষাটের দশকে কলেজে পড়তে গিয়ে র‍্যাগিং-এর শিকার হয়েছিলেন কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন-ও। সে বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, কী হয়েছিল কেউ যেন দয়া করে তাঁকে জিজ্ঞেস না করেন। তিনি কিছুতেই তা বলতে পারবেন না। সব মানুষের মানসিক গঠন এক নয়। শারীরিকও নয়। র‍্যাগিং-এর আঘাত সকলে সহ্য করতে পারেন না। তবু মানুষ তো প্রতিদিন, প্রতি সময়েই নিগৃহীত, লাঞ্ছিত হন। কখনও শিক্ষায়তন, কখনও কর্মস্থল, কখনও পরিবার, এমনকি হয়তো নিজের কাছেও। এই লজ্জা সবাই লুকিয়ে রাখতে, সহ্য করতে পারেন না, বেছে নেন আত্মহনন। কেউ হয়তো চিরতরে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমজনতার নিগ্রহ তো সর্বস্তরে। সর্বত্র তাঁদেরই লাঞ্ছনা বেশি। দিনের পর দিন লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির শিকার তারা। তবু মেনে নিতে হয়, সহ্য করতে হয়। এসবের আড়ালে জন্ম নেয় উগ্রবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ-কত কিছু। র‍্যাগিং তা শুধু অয়ন-আমনকে নয়, প্রতিনিয়ত শেষ করছে কত কিছুকে। আইন করে যা বন্ধ হওয়ার নয়। প্রয়োজন শুধু সর্বস্তরে প্রখর সচেতনতা।